রঙ্গেভরা বঙ্গদেশ : চতুর্থ পর্ব

ডাক দিয়ে এলো সাজ

মৈত্রেয়ী কুমার

দেকতে দেকতে গুদুম করে তোপ পড়ে গেলো। সেই শব্দে কাকগুলো কা কা ডাক ছেড়ে ইতিউতি পালালো। কাল ষষ্ঠী। যজমানের বাড়িতে বাড়িতে কুলপুরুতদের ব্যস্ততার সীমা নেই। শুধু আমাদের ঘোষাল পণ্ডিত চলেছেন উল্টো পথে। কুঠিবাড়ির রাস্তায় বাজার বসেছে। কুপীগুলো জ্বলছে রেড়ির তেলে। পোড়া তেলের গন্ধে বাতাস ভারি। বঁটি পেতে মেছুনীগুলো গুছিয়ে বসে হাঁকাহাঁকি জুড়েছে। “ও গামচা কাঁধে, ভালো মাছ নিবি?” — “ও খেংরা গুঁপো মিনসে, চার আনা দিবি?”

এই এলাকাটা ততো সুবিধের নয়। আপার চিৎপুর রোডে উঠেই ঘোষাল দেখেন যত্তো গুলিখোঁড়, গেঁজেল আর মাতালের ভিড়। “ফেরার পতে দুটো দুটো বদ্যিবাটির আলু নোবো। আর হাসমানের বেগুন।” ভাবতে ভাবতেই ঘোষাল পো-এর চমক ভাঙে খল্ খল্ খল্ খল্ হাসিতে। চমকে চেয়ে ঘোষাল দেখেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন খোদ একেবারে বেশ্যাবাড়ির বারাণ্ডার নীচে। “ওলো আজ মধু খেতে কে এয়েচে দ্যাখোসে,” বলে চেঁচামেচি পড়ে গেলো। খানকতক রাঁঢ় রূপোর বাঁধানো হুঁকায় তামাক খেতে খেতে “মিনসে আমার, দুগ্গা পূজার মাটি নিতে একুন এলে বুঝি?” বলে ঘোষালের হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে।

“এই, পালা, যাঃ” করতে করতে ঘোষাল যখন পৈতেগাছি জড়িয়ে প্রাণপণে গায়ত্রীরক্ষা মন্ত্র আওড়াচ্ছেন, বাড়িউলী মাসি এসে দাঁড়ালো। কোন ঘর থেকে ভেসে এলো খ্যামটা নাচের ঘুঙুরের রুনু ঝুনু। পৈতে জাপটে ধরে ঘোষাল চললেন বাড়িউলীর পশ্চাতে। বন্ধ দরজার ওপারে কি কথকতা হল তার বিশদ বিবরণে আমাদের কাজ কি!

ঘোষাল পত্নী পাড়ার আলতা পরানো নাপিত বৌ-এর কাছে খপর পেয়েছিলো যে ফুল্লরা তার হুলো সহ আশ্রয় পেয়েচে খোদ সোনাগাছির রাঢ়মহলে। খুব গোপনে একরকম অজ্ঞাতবাসে আচে সে। মাসি মোটা টাকার থলে আঁচলে গিঁট দিয়ে বেঁধে ফুল্লরা আর ঘোষাল পো-এর কতা কইয়ে দিলে। বদলে পৈতে হাতে ঘোষাল চোদ্দ পুরুষের নামে কিরে কাটলে যে ফুল্লরার কথা সে দিনের আলো ফুটবার সাথে সাথে ভুলে যাবে।

ফুল্লরার ‘ধন’টিকেও চোখের দেখা দেখলেন ঘোষাল এবং শুনলেন স্বয়ং দঁ গিন্নীর খাস দাসীর সেবাবৃত্তির সুবাদে ঐ সবুজ মণি ফুল্লরা না কি পেয়েছিলো। গুরুকে স্মরণ করে ঐ বেশ্যাবাড়ির মেজেতেই সাষ্টাঙ্গ হন ঘোষাল। বঁড়শি গেলো মাছকে ডাঙ্গায় তুলতে, বাকি শুধু একটা মোক্ষম সুতার টান। বিধাতাপুরুষ ঘোষালের ম্যানেজারি বুদ্ধি দেখে অলক্ষ্যে হেসে চোখ উল্টে নিলেন। কলি! ঘোর কলি!

পরের দিন প্রভাতের আলো ফুল্লরা দেকলো কি দেকলো না সেটা বড় কতা নয় কো। বড় কতা হল ফুল্লরাকে সাধ করে যে মণি দিয়ে সোহাগ দেখিয়েছিলো দঁ বাড়ির অন্দরমহল, তাদের দুজোড়া লেঠেলের হাতে সেই সোহাগ লুট হয়ে গেলো!

আজ ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় শহরের প্রতিমার অধিবাস হয়ে গেলো। এই কিছুক্ষণ আগে ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া থেমেচে। তকমাবিহীন সহিসের একটা জুড়ি গাড়ি নিঃশব্দে এসে থামলো কলুটোলার দেউড়ি বাড়িতে। সেখেনে তখন সাজো সাজো রব। “বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কীত্তন!” চাকরবাকররা সব তকমা এঁটে বাবুদের অ্যাই এটা আন্ রে, অ্যাই ওটা ধর রে - এর পেছনে ছুটোছুটি করে মরচে। দরজার দুই দিকে বসেছে পূর্ণঘট, সিঁদূর ফোঁটায় আম্রপল্লব। জামাই আর ভাগ্নাবাবুর দল নতুন জুতো মশমশিয়ে, ফিনফিনে ধুতির ফররা উড়িয়ে বকুম বকুম কচ্ছেন। দেউড়িতে কোন অন্ধ ভিখিরি গান ধরেছে — “এবার আমার উমা এলে / আর উমায় পাঠাব না। /বলে বলবে লোক মন্দ, গিরি - / কারোর কথা শুনবো না।”

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

কাল সপ্তমী। নবপত্রিকা স্নান হবে। টুলো পণ্ডিত মোসাএব পরিবৃত বাবুর সাথে বসে শেষবারের মতো ফর্দ আউড়ে নিচ্চে। কাড়া নাকাড়া টুলীর দল এট্টু জিরেন নিয়ে কালকের বাজনা বাজনের শলা করবে। অন্দরমহলে গিন্নীরা সবে মঙ্গলচণ্ডী শুনে জলপান দিয়েচেন মুকে, সবার ব্যস্ত-সমস্ততা অন্যমনস্কতা এসে জড়ো হল উঠোনের মাঝে। হীরে বসানো হাতির দাঁতের ছড়ি হাতে কে ও? সাক্ষাত দঁ বাবু! ও ব্যাটা একেনে এমন সময়? আমাদের বাবু জাজিম থেকে থলথলে দেহ ঠেলে তুলে বসলেন। লোকজনের তোয়াক্কা না করে দঁ ছড়ি উঁচিয়ে গমগম করে বললেন —

“কলুটোলার বেনে বাবু
তোর হুঁশ হবে কোন কালে?
আর কতকাল বাপের ঠেঙে
ঘরের বৌ রাখবি ফেলে?
ছ্যা ছ্যা দেয় লোক তোরে
থুতু দেয় তোর গালে
তোর ভাঙা নাকটা জোড়া দোবো
এক শর্ত পেলে।
টুকলিবাঈকে তুলে এনে বসা আমার কোলে।”

ব্যস্। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। নেই ব্যস্ততার ভিড়। দঁ বাবুর কথার শাপে কলুটোলার বাবুবাড়িকে যেন বোবায় পেলো। দঁ-এর শর্ত, সেই পায়রার ডিমাকৃতি সবুজ মণি ন বৌ-এর হাতে তুলে দেবে স্বয়ং দঁ বাবু। কলুটোলার বাবুদের বে-আব্রু আবার পর্দা পাবে। কিন্তু টুকলিবাঈকে বাবুর বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে আসতে হবে।

ধীরে ধীরে উঠোনে লোক জমতে থাকলো। বাবু ততক্ষণে থলথলে দেহ ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েচেন। চক্ষু রক্তবর্ণ। মুখে অপমানের ঘাম। দেহ থরোথরো। চেবানো পানের রসে কষে লাল দাগ। নিঃশব্দে কালো কুচকুচে ভৈরব মার্কা চেহারায় এসে দাঁড়িয়েচে বল্লাল। হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। চণ্ডীমণ্ডপের হ্যাজাক বাতির রোশনিতে চকচক করচে বল্লালের চোখ, লাঠি। ভাগ্নে জামাইরা ফুলেল সাজে থ মেরে ন যযৌ ন তস্থৌ! লাল পেড়ে চক্র বেড়ে ধুতি নামাবলী গায়ে ফরাস ঠেলে বিস্ফারিত চোখ মেলে ঠেলে উঠেছে টুলোও।

গগনভেদী বিকট চীৎকার দিয়ে “হুঁশিয়ার” বলে যেই একটা বাঘের মতো ডাক ছেড়েচে বল্লাল, অমনি কে যেন মিহি গলায় ভেংচি কেটে বললে, “অ্যাই! চোপ!” দঁ বাবুর থেকে সকলের চোখ সরে গেলো উঠোনের আর এক কোণে। ঘোষাল! লাল শালুতে শালগ্রাম শিলা বেঁধে এনেচে সে সত্য কথার কিরে কাটতে। হাত তুলে বল্লালকে তো রুকলেন বাবু, কিন্তু ততক্ষণে অন্দরমহল থেকে মড়াকান্নার রোল উঠেচে, “মা, মা, মা, কি অলপ্পেয়ে মিনসে হাড় হাবাতে! কি বজ্জাত মাগী! আমার মরণও হয় না কো! বচ্ছরকার দিন! কি ভাতার সুখ পাচ্ছি ওলো তোমরা দ্যাকোসে!”

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

একটানা কোষারব চলতেই থাকলো। হঠাৎ টুলোর কী হয়ে গেলো সে ছুটে এসে ঘোষালের কুতকুতে চোখে মারলে মোক্ষম এক ঘুঁষি। “বাপ্” বলে ঘোষাল পড়লেন দঁ বাবুর ঘাড়ে। দঁ-এর ভারি লাঠি গিয়ে ঠনাৎ হলো বল্লালের বাঁশে। বাঁশ ঘুরে ফটাস হলো কলুটোলার বাবুর টাকে। আচমকা আঘাতে ক্ষেপে গিয়ে বাবু এক চড় কষালেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা মোসাএব কানাই দত্তকে। যে কানাই কি না কখুনো বাবুর এ পজ্জন্ত বিরুদ্ধ করে নাই। এমুন কি বাবু যদি গোলাপী নেশায় তুর হয়ে বলেচে, “কেনো, সূজ্জ পচ্চিমে ওটে,” কানাই সঙ্গে সঙ্গে “আজ্ঞে” বলতে কসুর করেনি। সেই কানাই বিনা দোষে মার খেয়ে ভ্যাঁক করে দিলে কেঁদে।

চারিদিকে রোল পড়ে গেলো। গালাগালি, কান্না, তিরস্কার। ঘোষাল চোখ চেপে টুলোর বাপান্ত দিতে লাগলেন। “আদতে তোরা টোলের পণ্ডিত তা জানিস? মা-এর মন্দিরে পূজো করার মুরোদ আচে তোদের? চাল কলা ভিক্ষি করা বামুন কোতাকার!”

টুলোকে যেন পেঁচোয় পেলো। তিনি তার লালপেড়ে চক্রবেড়ে ধুতি কোমরে পেঁচিয়ে সারা উটোন তাণ্ডব করে বেড়াচ্চেন। “টুকলিবাঈ নেবে? টুকলিবাঈ নেবে? অ্যাঁহ্ রোসো, নোয়াচ্চি!”

মেনিমুখো টুলোর এমন ভীমা মূর্তি দেখে কলুটোলার বাবুর মেজাজ গেলো মিইয়ে। এমন সময় ভেতরবাড়ির কান্নার রোল সপ্তমে উটলো। গিন্নী মা ঘটিতে মাতা ঠুকে অজ্ঞান হয়েচেন। শশব্যস্ত হয়ে কর্তা যত্খন ভেতরবাড়ি গেলেন, দঁ বাবু আরাম করে ফরাসে বসে ঘোষালকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর লাঠিটা তুলে দিতে হাতে। কিন্তু লাঠি পড়ে আচে সাক্ষাত কালাপাহাড় বল্লালের পায়ের গোচের কাচে। ঘোষালের তখন শাঁখের করাত হাল। কি করবে ভাবচে এমুন সময় এক চিম্সেপানা লোক দেউড়ি দিয়ে ঢুকে এসে আর্ত গলায় “বাবু! বাবু! কত্তা বাবু!” বলে শোরগোল ফেলে দিলো।

তার ডাকের আকুতিতে কিছু অমঙ্গলের আভাস ছিল। গিন্নীকে ছেড়ে কত্তা আবার হন্তদন্ত হয়ে বার হলেন উটোনের আসরে। দেকেন শ্যামবাজারের দেওয়ান বাড়ির দূত! দঁ-এর দাঁতের কামড়ানিতে এমনিতেই ফালা ফালা হয়েচেন, এখন এ ব্যাটা কি সেই আঘাতে নুন ছিটোতে এলো? আর এলোও কি না এক্কেরে মোক্ষম মূহুর্তে!

দেওয়ানের দূত কেঁদে কেশে হিক্কা তুলে যে খপরটি পেশ করলো তা বহুকষ্টে উদ্ধার করলে এই দাঁড়ায় — দেওয়ান বাড়ির দেউড়িতে আজ বিদ্যেসুন্দর পালা যাত্রা হচ্চিলো। বাবুর বাড়ির কত্তারা সব ইয়ার দোস্ত নিয়ে যাত্রা দেখতে বসেচিলেন। চলচে মদ্যপান। মালিনী সুন্দরী আর বিদ্যা সবার মনে মদনের বান মেরে মুঠো মুঠো ‘প্যালা’ পাচ্চে। দুই ছোকরা সখী সেজে তার দু’পাশে কোমর হেলাচ্চে খেমটা নেচে। বাবুরা নেশায় চুর। ক্রমে ক্রমে পালার পর্ব ধরে ধরে মিলনের যন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রানীর মুখঝামটা, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো। কোটাল এসে মালিনীকে বেঁধে পিটোতে আরম্ভ করলে। মালিনী দেওয়ান বাড়ির দেউড়ি মহল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাবুদের দোহাই পেড়ে পেড়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলে। “হটাৎ কোতা হতে কিচু নাই, কত্তাবাবু ‘কোন হারামজাদার পো আমার সামনে হতে আমার মালিনীকে নে যায়?’ বলে হুঁকার দে সামনে রাকা রূপোর গেলাসখানা মারলেন ছুঁড়ে কোটালের রগে। অমনি কোটাল ‘অ্যায় বাপ্’ বলে চিত্তির। চাদ্দিক থে নোক এসে পড়লে। ধরাধরি করে কোটালকে নে গেলো। জলছিটে, বাতাস কতকিচু করা হলো, কোটাল সোজা খাঁড়া হাতে সগ্গে গেলো।”

ইদিকে খপর পেয়ে সার্জেণ্ট এয়েচেন দেওয়ান বাড়িতে। কত্তার কি গতি হবে তা জানা নাই। গিন্নী মা কেঁদে কইলেন তারে কলুটোলায় এসে দুঃসংবাদ দিতে। গিন্নী মা কইলেন, “কলুটোলার কত্তা বাবুর মতো বাবু, মরদের মতো মরদ। তাইলে পুতের বৌরে নে যাক। সমাজে মান সম্মান সব তো গেচে, এখন এই অসৈরণ! আমার মাতা খাক তারা, বৌরে ঝেনো নে যায়।”

আমাদের বাবু মতিস্থির করার সুযোগই পেলেন না। ন’ পুত্র ভীম হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন “গাড়োয়ান!” বলে। রাঁঢ়ের সাথে বাড়ির বধূদের মিলালে চলে না। এক রাঁঢ় গেলে হাজার আসবে। কিন্তু খোয়ানো সম্মান একবার গেলে আর আসবে না। অতএব দঁ বাবু মলমলে পাঞ্জাবী ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চণ্ডীমণ্ডপে অহৈতুকী কৃপাকারিণী ‘মা’-কে বিরাশি সিক্কা ওজনের ‘মা - মা’ বলে হেঁকে একটা জমাটি পেন্নাম ঠুকলেন। তারপর পাঞ্জাবীর কোঁচড় থেকে বেরুলো একখানি লাল ভেলভেটের বাক্স।

বাক্স খুলতেই সবুজ দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো আঙিনায়। রূপোর কৌটো খুলে পান মুখে দিয়ে দঁ বললেন, “আমার দাদু একসময় বিলেতে ঘুরেচেন ফিরেচেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি তখন ফ্রান্সের পারী শহরে। দাদুর শখ ছিল কিউরিও শপে। এক দোকানে একদিন দেকেন রূপোর পাতের উপর করা ফুলের নকশা। ব্রাস আর কপারের মিশেলে রূপোর কাজ। মনে ধরে গেলো, প্রতিমের আটচালা সাজাবেন। রাংতার মতো জ্বলবে রূপোর তবক। পাঁচশো পিস্ অর্ডার দিলেন একধারে।

“দোকানের মালিক খুব খুশী হলেন দাদুর বিশাল কেনাকাটায়। পূজার মুখে ডাক মারফত সাজ এলো সেই ফ্রান্স থেকে। ডাকের সাজের বাক্সে দাদু পেলেন এই মণি। সাথে চিটি। দোকানের মালিক লিখেছেন, সেই সুদূর ভারত থেকে দাদুর পারী শহরে এসে এই ক্রয়ের বহরে তিনি আপ্লুত। উপহার স্বরূপ তিনি সঙ্গে পাঠাচ্ছেন একটা ভারী দুষ্প্রাপ্য পান্না। দাদু স্বীকার করলে তিনি খুশী হবেন।”

চণ্ডীমণ্ডপে ঢাকের বাদ্যি নেই। পালাও বসেনি কো। তবু লোকের ভিড়। শুনছে সব দঁ বাড়ির ডাকের সাজের কাহিনী।

(ক্রমশঃ)

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com